বাংলা কবিতায় ছন্দ কত প্রকার ও কি কি?
ছন্দ নির্ণয়ের কৌশল

এটি মূলত তিন প্রকার। যথা :
১. স্বরবৃত্ত ছন্দ।
২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।
৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।

নামগুলো হয়ত বা আমাদের সবারই চেনা। কিন্তু, এদের প্রকৃত ব্যবহার আমাদের অনেকেরই জানা নেই। তাই চলুন, এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

ছন্দ সম্পর্কে জানার আগে, চলুন প্রথমে আমরা কিছু চিহ্ন সম্পর্কে জেনে নেই। কারণ, এগুলোর ব্যবহার দেখেই আমরা ছন্দ চিনব। এগুলো একেক ছন্দে একেকভাবে ব্যবহার হয়, আর এদের সুষ্ঠু ব্যবহার কবিতাকে করে তোলে সার্থক ও শ্রুতিমধুর। এগুলো হল, "অক্ষর", "মাত্রা", "মুক্তাক্ষর", "বদ্ধাক্ষর বা যুক্তাক্ষর", "পর্ব", "অতিপর্ব" ইত্যাদি। আপাতত এই কয়টি জানলেই চলবে। তাই, এখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সবার আগে অক্ষর নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি, প্রতিটি বর্ণই একেকটি অক্ষর। কিন্তু, বাংলা ব্যকরণের ভাষায় তা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। আমরা জানি, মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ থেকে যে সকল শব্দ বা আওয়াজ

বের করে তাই ধ্বনি। আবার, ধ্বনির লিখিত রূপই হল বর্ণ। কিন্তু, মানুষ কোন শব্দ উচ্চারণ করার সময়, একবারে যতগুলো কম সংখ্যক বর্ণ উচ্চারণ করে, তাদের একেকটিকে একেকটি অক্ষর বলে। চলুন, আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি। এর জন্য আমরা ‘‘কলম” শব্দটি বাছাই করলাম। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে, এই একটি শব্দই উদাহরণে ব্যবহার করার চেষ্টা করব। এবার কাজের কথায় আসি। খেয়াল করে দেখুন, ‘‘কলম’’ শব্দটি আমরা দুই ভাগ করে উচ্চারণ করছি ‘‘ক”, ‘‘লম্” এভাবে। শুধুমাত্র ‘‘কলম” শব্দটিই নয়, প্রতিটি শব্দই, আমরা এমন ভাগ ভাগ করেই উচ্চারণ করি। আর এই প্রতিটি ভাগই হল একেকটি অক্ষর। মাত্রা নিয়ে আলোচনার সময় বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাহলে, চলুন আমরা মাত্রা শিখে ফেলি।

মাত্রা ও অক্ষর

সাধারণত কোন একটি শব্দের প্রতিটি অক্ষরকেই, একমাত্রা বলে বিবেচনা করা যায়। বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কী? চলুন উদাহরণে যাই, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। চলুন, আমরা ‘‘কলম’’ শব্দটি উচ্চারণ করি ‘‘ক’’, ‘‘লম্’’ এভাবে। আপনি নিজে একবার বলার চেষ্টা করুন। খেয়াল করুন, আপনি কিন্তু ‘‘ক’’ ‘‘ল” ‘‘ম’’ এভাবে বলছেন না। ‘‘ক’’, ‘‘লম্’’ এভাবেই বলছেন। সুতরাং ‘‘ক’’ একটা মাত্রা এবং ‘‘লম্’’ একটা মাত্রা।

আপনারা হয়ত ভাবছেন, অক্ষর এবং মাত্রার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু, এদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। আসলে অক্ষরের ধারণা

থেকেই মাত্রার উৎপত্তি। কখনো কখনো, একটি অক্ষরে দুই মাত্রাও হতে পারে। আমি মনে করি, এখনি বিষয়টিকে এতো জটিল করে ভাবার কোন কারণ নেই। তার চেয়ে চলুন, মাত্রার স্পষ্ট ধারণা নিতে আমরা আরও কিছু শব্দ পর্যবেক্ষণ করি। যেমন, খাতা = খা, তা ; গীটার = গী, টার ; ক্যালকুলেটর = ক্যাল, কু, লে, টর ; হাইফেন = হাই, ফেন ইত্যাদি। এখানে, খাতা দুই মাত্রা, গীটার দুই মাত্রা, ক্যালকুলেটর চার মাত্রা, হাইফেন দুই মাত্রা।

আমরা মাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। মনে প্রশ্ন জাগছে কী ? একটি বর্ণ বিশিষ্ট অক্ষরও এক মাত্রা, আবার দুই বর্ণ বিশিষ্ট অক্ষরও এক মাত্রা, ঘটনা কী? আসলে, মাত্রা বর্ণের পরিমাণের উপর না, বলার ভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

মুক্তাক্ষর

এবার, মুক্তাক্ষর নিয়ে আলোচনা করা যাক। যখন একটি অক্ষরে একটিই বর্ণ থাকে, তখন তাকে মুক্তাক্ষর বলে। যেমন, "কলম" শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি অক্ষর "ক", "লম্" পাওয়া যায়। এতে, "ক" একাই একটি অক্ষর, সুতরাং এটি মুক্তাক্ষর।

বদ্ধাক্ষর

এবার, যদি একাধিক বর্ণ মিলে একটি অক্ষর বুঝায়, তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। সুতরাং, "কলম" এর "লম্" হল বদ্ধাক্ষর। এখন, একটি বড় শব্দের ক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করি। যেমন, প্রত্যুৎপন্নমতি = প্রত্, তুৎ, পন্, ন, ম, তি। এখানে, ন, ম, তি এই তিনটি মুক্তাক্ষর এবং

প্রত্, তুৎ, পন্, এই তিনটি বদ্ধাক্ষর। আশাকরি, মুক্তাক্ষর আর বদ্ধাক্ষর চিনতে আপনাদের আর কোন সমস্যা হবে না।

পর্ব বিভাজন : পূর্ণ পর্ব, অতিপর্ব, অপূর্ণ পর্ব

এবার পর্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করছি। পর্বের সংজ্ঞা অনেকটা অক্ষরের মতোই। এক নিঃশ্বাসে যতগুলো কম সংখ্যক শব্দ একবারে পড়া যায়, তাদের সমষ্টি হল একটি পর্ব। চলুন আমরা উদাহরণে যাই। যেমন,

ঐ খানে তোর / দাদির কবর /
ডালিম গাছের / তলে /

এখানে, প্রতিটি (/) চিহ্নের মধ্যের শব্দ সমষ্টিই এক একটি পর্ব। যেমন, (ঐ খানে তোর, দাদির কবর, ডালিম গাছের) এই তিনটি একেকটি পরিপূর্ণ পর্ব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পর্বতো বুঝলাম, তাহলে শেষের ‘‘তলে” কথায় গেল? ওর কি পা আছে যে হেঁটে চলে যাবে। নাকি তার ডানা আছে, যে উড়ে যাবে। এটাও বলছি, তার আগে অতিপর্বের সংজ্ঞা দিয়ে নেই।

যখন, একটি শব্দ নিয়ে একটি পর্ব বুঝাবে, তখন তাকে আমরা অতিপর্ব বলব। সুতরাং, এখানে ‘‘তলে” হল, অতিপর্ব। একে অপূর্ণ পর্বও বলা যেতে পারে। এখন চলুন আমরা আরেকটি কবিতা দেখি,

এই নেয়েছে / ঐ নিল যাঃ / কান নিয়েছে / চিলে /

চিলের পিছে / মরছি ঘুরে / আমরা সবাই / মিলে /

নিশ্চই বুঝতে পারছেন, “চিলে” এবং “মিলে” হল অতিপর্ব, বাকি গুলো পূর্ণ পর্ব। সুতরাং, এই দুটি লাইনে ছয়টি পর্ব এবং দুইটি অতিপর্ব আছে।

বি. দ্র.
১. পর্ব বোঝানোর জন্য (/) চিহ্ন, মাত্রা বোঝানোর জন্য অক্ষরের উপর (–) চিহ্ন এবং একমাত্রা (অর্ধ চাঁদ) ও দুইমাত্রা বোঝানোর জন্য (–) চিহ্নের উপর যথাক্রমে এখানে (।) বা (।।) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. মুক্তাক্ষরে কখনো দুই মাত্রা হতে পারে না। কিন্তু বদ্ধাক্ষরে দুই মাত্রাও হতে পারে।

৩. লেখার কিছু কিছু ক্ষেত্রে “আনুসঙ্গিক পর্ব” কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা পরষ্পর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বা সমান মাত্রা বিশিষ্ট্য পর্বকে বোঝানো হয়েছে।)

আমরা এবার বাংলা কবিতার ছন্দ শিখি।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

সাধারণত ছড়া জাতীয় কবিতাগুলো স্বরবৃত্ত ছন্দের হয়। কিন্তু, এটা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা হল, যে সকল কবিতার মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরে একমাত্রা হয়, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা বলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি লাইনে সাধারণত মাত্রা সংখ্যা সমান থাকে। যেমন, এই কবিতাটি হয়তো বা ছোটবেলায় আমরা সবাই পড়েছি,

"খোকন খোকন ডাক পারি
খোকন মোদের কার বাড়ি"

কবিতাটি বিশ্লেষণ করি।
।।।।।।।
খো কন খো কন / ডাক পা রি /
।।।।।।।
খো কন মো দের / কার বা ড়ি /

কী, বোঝা যাচ্ছে ? এখানে, (খোকন খোকন, খোকন মোদের) পরষ্পর আনুসঙ্গিক পর্ব এবং দেখুন প্রতিটি পর্বই চারমাত্রা করে। আবার, (ডাক পারি, কার বাড়ি) পরষ্পর আনুসঙ্গিক পর্ব এবং এরা প্রত্যেকেই তিনমাত্রা করে। এখন খেয়াল করে দেখুন, প্রতিটি লাইনে ৪ + ৩ = ৭ মাত্রা। সুতরাং, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এটা স্বরবৃত্ত ছন্দ।

তাহলে বোঝা গেল, ছন্দ চেনার জন্য আগে পর্বে ভাগ করতে হবে, তারপর মাত্রায় বিভক্ত করতে হবে। এরপর মাত্রা গুনে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আমরা কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দ শিখে ফেলেছি।

এখন চলুন আমরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নিয়ে আলোচনা করি।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
সাধারণত গীতিকবিতা গুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের হয়ে থাকে। যে সকল কবিতায়, বদ্ধাক্ষরে দুইমাত্রা এবং মুক্তাক্ষরে একমাত্রা হয়, তাদের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা বলে। বদ্ধাক্ষরেও যে দুই মাত্রা হয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ তার প্রমাণ। এখানে বদ্ধাক্ষর, মুক্তাক্ষরের আগে, মধ্যে বা পরে যেখানেই থাকুক না কেন, বদ্ধাক্ষরে দুই মাত্রা হবে। আচ্ছা বলুনতো, যদি বদ্ধাক্ষরে একমাত্রা হত তাহলে কি হত ? ভুলে গেলে আগের পৃষ্টা গুলো আবার পড়ুন, আর যদি সে ধৈর্য না থাকে, তাহলে আমার সাথে এগিয়ে চলুন। তাহলে, এক্ষেত্রে হবে স্বরবৃত্ত ছন্দ। আগের কথাগুলো আপনাদের সুবিধার্থে আরও একবার আলোচনা করে নিলাম। আমার মনে হয়, আপনারা স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন। তাহলে চলুন, আমরা একটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা দেখি। যেমন, পল্লী কবি জসীম উদদীনের ‘‘কবর” কবিতাটি দেখতে পারি। এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা।

‘‘ঐ খানে তোর দাদির কবর
ডালিম গাছের তলে

তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি
দুই নয়নের জলে”।

কবিতা তো দেখা হল, এখন কাজ কী ? চলুন বিশ্লেষণ করি।

ওই খা নে তোর / দা দির ক বর
||||||||
ডা লিম্ গা ছের / ত লে /
|||| ||||||||
তি রিশ ব ছর / ভি জা য়ে রে খে ছি /
||||||||
দুই ন য় নের / জ লে

দেখুন, এখানে বদ্ধাক্ষরেও দুই মাত্রা পরেছে। শুধু তাই না, আরও খেয়াল করে দেখুন কোথাও কোথাও বদ্ধাক্ষর মুক্তাক্ষরের আগে আবার কোথাও কোথাও পরে। কিন্তু, মজার বিষয় হল, উভয় ক্ষেত্রেই দুইমাত্রা পড়েছে। এটিই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আচ্ছা, লাইন দুটিতে দুটি শব্দ আছে “তলে”, “জলে”, এদেরকে কি বলা হয় মনে আছে ? আরে, এরা হল অতিপর্ব! আমরা কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দও শিখে ফেলেছি, তাহলে এখন বাকি থাকল, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, তাহলেই শেষ।

চলুন আমরা অক্ষরবৃত্তটাও শিখে ফেলি।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

বাংলা কবিতার ছন্দে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ছন্দ হল এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। কারণ, এটি যত প্রকারে নিজের অস্তিত্ব তুলে ধরেছে, আর কোনো ছন্দই তা পারেনি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রকার ভেদের অভাব নেই। কিন্তু, এ লেখাতে আমরা এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করতে যাব না। পরবর্তীকালে যদি সুযোগ হয়, তাহলে শুধু অক্ষরবৃত্তের প্রকারভেদ নিয়ে একটি লেখা লিখব। এই লেখাতে আমরা শুধু ছন্দ চিনব এবং এর ব্যবহার শিখব।

যে সকল কবিতায়, মুক্তাক্ষরে একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষর যদি শব্দের শুরুতে (আদিতে) বা মধ্যে থাকে তাহলেও এক মাত্রা হয়। কিন্তু, বদ্ধাক্ষর যদি শব্দের শেষে থাকে তাহলে দুইমাত্রা হয়, তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। আমার মনে হয় সংজ্ঞাটি একটু কঠিন হয়ে গেছে। আপনারা সংজ্ঞাটি কয়েকবার করে পড়ুন এবং নিজে বোঝার চেষ্টা করুন। তাতেও যদি না বোঝা যায়, সামনে উদাহরণত দেওয়াই হচ্ছে, তখন ঠিক হয়ে যাবে। আগে এ সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে নেই, তারপর আমরা উদাহরণে যাব।

এর সাথে মাত্রাবৃত্তের সামান্য মিল আছে। এ দুটি ছন্দে একটি প্রধান পার্থক্য হলো, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্বদাই বদ্ধাক্ষরে দুইমাত্রা। কিন্তু, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শুধুমাত্র শব্দের শেষের বদ্ধক্ষরে দুইমাত্রা,

বাকিগুলো একমাত্রা। তবে হ্যাঁ, যদি একটি পূর্ণ শব্দ (স্বাধীনভাবে) একাই একটি বদ্ধাক্ষর হয় তাহলে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বেলায়ও দুইমাত্রা হবে। এখন আমরা উদাহরণে যেতে পারি। যেমন, আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের “বঙ্গভাষা” কবিতাটি দেখব,

“হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি”
এখন বিশ্লেষণে আসি,
। । । । । । । । । । । । । ।
হে বঙ্ গ ভান্ ডা রে ত ব / বি বি ধ র তন /
। । । । । । । । । । । । । ।
তা স বে অ বোধ আ মি / অ ব হে লা ক রি /

এখন চলুন, সংজ্ঞার সাথে মেলানোর চেষ্টা করি। কবিতাটিতে মুক্তাক্ষরে একমাত্রা করে আছে। বদ্ধাক্ষর শব্দের শুরুতেও আছে আবার শব্দের শেষেও আছে। কিন্তু এতে মাত্রাবৃত্তের মত শব্দের শুরু বা মধ্যর বদ্ধাক্ষরে দুইমাত্রা হয়নি বরং শুধু শব্দের শেষের বদ্ধক্ষরে দুইমাত্রা হয়েছে। আশাকরি, আপনারা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাগত পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এছাড়াও, এদের মধ্যে আরো পার্থক্য আছে। সেগুলো আমাদের আপাতত জানার দরকার নেই। শুধু যেসব কথা না বললেই নয়, সেগুলোই বলব।

আপনারা হয়ত আমার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণটি দেখে বলছেন, “লোকটা বলছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে, আবার উদাহরণ দিচ্ছে ভুল। আরে এটাতো সনেট সবাই জানে”। আমিও বলছি, এটা সনেট। কিন্তু, তাহলে আমি এই উদাহরণটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে দিলাম কেন ? এর কারণ, আমি আপনাদের বোঝাতে চাইছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কতটা বিস্তৃত এবং সনেট এই বিস্তৃত অংশের একটি সামান্য অংশ বিশেষ।

লেখার শুরুতে আমরা জেনেছি ছন্দ মূলত দুই প্রকার, স্বরবৃত্ত ছন্দ ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। তাহলে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কোথায় গেল ? আসলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি অংশ। যখন দেখা গেল কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন কবিতার প্রতিটি বদ্ধাক্ষরেই দুইমাত্রা পরছে, কিন্তু এতে ছন্দের বা কবিতার লয়ের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, তখন একে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকে আলাদা করে ফেলা হয় এবং এই বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে নাম দেয়া হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এভাবেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হয়।

এতক্ষণ যাবত আমি আপনাদের সামনে বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কিত কিছু সাধারণ বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তাই আমার দেয়া এই কয়েকটি উদাহরণ পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য কবিতা দেখুন। এরপর কবিতাটি নিয়ম অনুসারে বিশ্লেষণ করুন এবং নিজে ছন্দ নিরুপণ করার চেষ্টা করুন। এতে ছন্দ সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। কবিতা বিশ্লেষণ করার সময় কবিতাটি খুব ধীরস্থিরভাবে আবৃত্তি করার চেষ্টা করুন এবং নিয়ম মতো

পর্বে বিভক্ত করুন। এরপর মাত্রায় বিশ্লেষণ করে প্রতি মাত্রার জন্য প্রথমে একমাত্রা হিসাব করুন। এতে যদি প্রতিটি আনুসঙ্গিক পর্বে মাত্রা সংখ্যা সমান হয়ে যায় তাহলে সিদ্ধান্ত হবে স্বরবৃত্ত ছন্দ। আর যদি এতেও না মিলে, তবে শব্দের শেষের বদ্ধাক্ষরগুলোতে দুইমাত্রা বসান। মিলে গেলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। ধরুন এতেও মেলেনি, তাহলে সকল বদ্ধাক্ষরে দুই মাত্রা বসান। মিলে গেলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কোন কোন সময় এক মাত্রা কম বা বেশি হতে পারে। এতে দুশ্চিন্তার কোন কারন নেই। যদি বলার ভঙ্গি দিয়ে এ ত্রুটি দূর করা যায়, তবে ছন্দ ঠিক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বলার বা আবৃতি করার সময় লয় এদিক সেদিক করা যাবে না। এতে ছন্দ সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নাও পাওয়া যেতে পারে। ছন্দ বোঝাটা আপনার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তাই বেশি বেশি কবিতা পড়ুন এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখুন। একটি জিনিস সব সময় মাথায় রাখবেন, একটি সন্তানের যেমন একজনই মা থাকেন, তেমনি একটি কবিতার ও একটি ছন্দ থাকবে। আবার এও মাথায় রাখতে হবে, মা ছাড়া যেমন কোন সন্তান থাকা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি ছন্দ ছাড়াও কোন কবিতা হতে পারে না। সুতরাং, আমরা যখন কোন কবিতা বা গান রচনা করব, তখন অবশ্যই তাকে কোন না কোন ছন্দের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। তাই ঠিক মত বুঝে কবিতা রচনা করুন।

এই লেখাটিতে, আমি আপনাদের সাথে আমার ছন্দ বিষয়ক সামান্য জ্ঞানের কিছু অংশ ভাগাভাগি করে নেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি আমার সাধ্যমত সহজভাবে আপনাদের বাংলা কবিতার ছন্দ

শেখানোর চেষ্টা করেছি। জানি না কতটুকু পেরেছি। তবে আমার এই প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হবে, যখন আপনারা ছন্দ না বুঝে আর কবিতা রচনা করবেন না এবং নিয়ম গুলো আপনাদের আয়ত্তে আনবেন। আর এর জন্য বেশি বেশি কবিতা আবৃত্তি এবং পরিপূর্ণ বিশ্লেষণের কোন বিকল্প নেই। শুধুমাত্র আমার কথাগুলোকেই ছন্দ শেখার জন্য পরিপূর্ণ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এজন্য আরো বেশি বেশি বই পড়ুন, আরো বেশি জানুন এবং সুন্দর, সুষ্ঠু ও সাবলীল কবিতা বা গান রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করুন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এই কথাটি বোঝানোই ছিল আমার লেখাটির প্রধান উদ্দেশ্য।

নবনীতা চৌধুরী
সুত্র : ত্রিভুবন জিৎ

ছন্দ কী **?** বিভিন্ন প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, প্রয়োজনীয়তা ও পার্থক্য আলোচনা কর।

সংস্কৃত ভাষায় ‘ছন্দ’ শব্দের এক অর্থ ‘কাব্যের মাত্রা’, আর এক অর্থ ‘ইচ্ছা’ তাই, ‘মাত্রা নিয়মের যে বিচিত্র্যতায় কাব্যের ইচ্ছাটি বিশেষভাবে ধ্বনি-রুপময় হয়ে ওঠে, তাকেই ছন্দ বলে।’

‘ছন্দ’ শব্দের ব্যাপক অর্থ ‘গতি-সৌন্দর্য। ছন্দের সংজ্ঞা প্রদান সম্পর্কে ছান্দসিকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়, এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।’

তারাপদ ভট্টাচার্যের মতে, ‘ভাষার অন্তর্গত প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্যই ছন্দ।’

বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় এবং তাহার মধ্যে একটা কৌশলগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকেই ছন্দ বলে।’

উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যে ড. সুনীতিকুমারের সংজ্ঞাতে ছন্দের প্রায় সব বৈশিষ্টই পাওয়া যায়।

ছন্দের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের মনে রস আস্বাদনের যে অনুভূতি তাকে পরিবৃত্ত করবার জন্য ছন্দের প্রয়োজন হয়। ছন্দস্পন্দনকে আয়ত্ত করে রস যতটা গাঢ় হয়ে উঠতে পারে, ছন্দস্পন্দনহীন কবিতার রস ততটা গাঢ় হয় না। ছন্দের প্রয়োজন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্মরণযোগ্য উক্তি -‘ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়; তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।’

যেহেতু সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ দ্বারা ভাষাকে গম্ভীর করার উপায় নেই; তাই বাঙালি মাত্রেই ভাষার উচ্ছ্বাসের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাকে ছন্দের সংযমে বাঁধতে পারলেই এর ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই বিশেষ পরিমাণগত পদস্থাপনের পদ্ধতি কবির বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাময় করে বলেই বাংলা কবিতায় ছন্দের আবশ্যকতা একান্ত অপরিসীম।

ছন্দের শ্রেণিবিভাগ : বাংলা কবিতার ছন্দকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১. স্বরবৃত্ত ছন্দ ২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। নি¤েœ এ তিন প্রকার ছন্দের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো-

স্বরবৃত্ত ছন্দ : যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব সময় একমাত্রা গণনা করা হয় এবং প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। সাধারণত এ ছন্দে চরণের প্রতি পর্বে চার মাত্রা ও দুই পর্বাঙ্ক থাকে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য

১.স্বরবৃত্ত ছন্দে যে কোন অক্ষর একমাত্রার।

২. প্রত্যেক পর্বে কমপক্ষে একটি করে যুগ্মধ্বনির অবস্থান থাকে।

৩. চার মাত্রার পর্বভাগই এ ছন্দের আসল কথা।

৪. স্ববৃত্ত ছন্দের প্রত্যেক চরণের প্রত্যেক পর্বে প্রথমে একটি করে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে।

৫. এ ছন্দে পূর্বের অক্ষরের স্বর কোনটাই দীর্ঘ নয়, সবগুলোই হ্রস্ব, যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর পর্যন্ত হ্রস্ব।
৬. এতে যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে একমাত্রার।
৭. এর ভাব লঘু চপল
৮. এ ছন্দের লয দ্রুত।
৯. এতে প্রবল শ্বাসাঘাত যুগ্ম-ধ্বনির প্রভাবে একপ্রকার ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ : যে ছন্দে বদ্ধাক্ষর সর্বত্রই দুই মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়, তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য
১. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদল সর্বদাই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রার হয়।
২.এ ছন্দে উচ্চারিত অক্ষর-ধ্বনি থেকেই মাত্রারীতি স্থিরীকৃত হয়।
৩. এ ছন্দে কেবল স্বরান্ত অক্ষর দ্বারাই পর্ব সংঘটিত হয়।
৪. এ ছন্দে সাধুভাষা বা সাধুরীতির ব্যবহার বেশি।
৫. এ ছন্দে শব্দ-ধ্বনির প্রাধান্য বেশি
৬. এ ছন্দে স্বরবৃত্তের মতো ধ্বনি সংকোচ নেই; আছে ধ্বনিবিস্তার
৭. এ ছন্দের মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয়, সাত, এবং আট মাত্রার। তবে এ ছন্দে ছয় মাত্রার চালই বেশি।
৮. এ ছন্দের লয় বিলম্বিত, গতিবেগ ঢালাসুরে একটানা প্রবাহিত।
৯. এর ভাব ললিত মধুর
১০. এ ছন্দের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর গীতিপ্রবণতা বা সুরনিষ্ঠতা।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ : যে ছন্দের আদিতে ও মধ্যে যুগ্মধ্বনি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে একমাত্রা এবং শেষে যুগ্মধ্বনি থাকলে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রা ধরা হয়, সে ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য
১.অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূল পর্ব দুটি-আট ও ছয় মাত্রার।
২. এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যের যুগ্মধ্বনি ঠাসা বা সংশ্রিষ্ট উচ্চারণে একমাত্রার এবং শেষের যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রার।
৩.এ ছন্দে সাধুভাষার ব্যবহার বেশি।
৪.এ ছন্দে লয় ধীর বা মধ্যম।
৫.এ ছন্দে চরণস্থ পর্বসমূহে অক্ষর ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করে একটা অতিরিক্ত সুরের তান নিয়ত প্রবাহমান।
৬.এ ছন্দ যেহেতু অক্ষর সর্বস্ব; তাই এর অক্ষর গুণে মাত্রা ঠিক করলেই চলে।
৭.এ ছন্দে আদি ও মধ্যের যুগ্মধ্বনি বা বদ্ধাক্ষর চার জায়গায় দ্বিমাত্রিক।
৮.এ ছন্দে তানের প্রবাহে এর অন্তর্গত যুক্ত ব্যঞ্জনের মাত্রা সংকুচিত হয়ে একমাত্রা হয়।
৯.এ ছন্দের ভাব ও ভাষা গভীর, গম্ভীর, বিপুল এবং বিশাল।
১০.এ ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সাধারণ শোষণশক্তি যার ফলে যুক্তাক্ষরবিহীন পর্বকে যুক্তাক্ষরবহুল করলেও এর মাত্রা সংখ্যার কোন তারতম্য হয় না।

সূত্র : সালেক শিবলু
ছন্দের শ্রেণিবিভাগ | ছন্দ নির্ণয়|
ছন্দ | chondo| ছন্দের শ্রেণিবিভাগ | ছন্দ নির্ণয়|

ছন্দ :
ছন্দ হল শ্রুতিমধুর শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা কানে জায়গায় ধ্বনি সুষমা, চিত্তে জাগায় রস।
পদ্য রচনার বিশেষ রীতি ছন্দ। তা কাব্যের প্রধান বাহন। গদ্যেও ছন্দ থাকতে পারে। তবে পদ্যেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। ছন্দ মানুষের কথার উপর সৃষ্ট। তা কানে শোনার বিষয়। তা কবির সৃষ্টি। তা কথার শিল্প। তা ধ্বনির সৌন্দর্য। ছন্দ তাই শিল্পীত বাক্ রীতি।

কাব্যের রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনিবিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে। (বাঙলা ছন্দ : জীবেন্দ্র সিংহরায়)
অর্থাৎ, কবি তার কবিতার ধ্বনিগুলোকে যে সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিন্যস্ত করে তাতে এক বিশেষ ধ্বনিসুষমা দান করেন, যার ফলে কবিতাটি পড়ার সময় পাঠক এক ধরনের ধ্বনিমাধুর্য উপভোগ করেন, ধ্বনির সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই ছন্দ বলা হয়।

আমরা প্রতিদিন যে কথা বলি তা ভেবে চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলি না। যেকোনো শব্দ যেমন খুশি ব্যবহার করি। সেজন্য কোনো নিয়ম বা আদর্শ মানতে হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য - শ্রোতাকে যে-কোনো-প্রকারে বক্তব্যটি বোঝাতে হবে। যেমন একটি সাংসারিক কথাবার্তা :

রাগ করো না। তোমার পায়ে পড়ি। কী করলে টাকা আসবে ? তুমিই উপায় বলো। সোনাদানায় ঘর ভর্তি করে দেবো।

দারিদ্র্যের জীবনে স্ত্রীকে কথাটি বলেছে তার স্বামী। মুখে যা এসেছে তাই সে বলেছে। চমৎকার করে বলতে সে কিছু কায়দা করে নি। শব্দগুলিকেও কোনো নিয়মে আনতে হয়নি। মিষ্টি মধুর শব্দও সে খুঁজে নি। কিন্তু এই কথাটাই যখন কবি প্রকাশ করলেন :

"ধরা নাহি দিলে ধরিব দু পায়
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়, বুদ্ধি জোগাও তুমি। " - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন এই শব্দগুলি হয়ে উঠল শ্রুতিমধুর সেগুলিকে তিনি সাজালেন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে। তখন স্বামীর এলোমেলো কথাই হয়ে উঠল এক চমৎকার শিল্প। তখন কথাটা হল শোনার মতো কানে লাগার মতো। আর সেই শিল্প থেকেই সৃষ্টি হল রস। তখন শ্রোতার বুঝতে ভালো লাগল বক্তব্যবিষয়টি।এই হল ছন্দ।

বিভিন্ন প্রকার ছন্দ সম্পর্কে জানার পূর্বে ছন্দের কিছু উপকরণ সম্পর্কে জেনে নেয়া জরুরি।

ছন্দের উপকরণ :

অক্ষর : বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে শব্দের যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বা দল বলে।

যতি : আমরা যখন কথা বলি তখন নিশ্চয়ই অনর্গল বলি না, কথা বলার মাঝে মাঝে থেমে যাই আর এই থেমে যাওয়া বোঝাতে যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার করা হয়। কোনো কবিতা পড়ার সময় শ্বাসগ্রহণের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অন্তর অন্তর যে উচ্চারণ বিরতি নেওয়া হয়, তাকে ছন্দ-যতি বলে। কবিতার ছন্দের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেখানে থামতে হয় তার নাম “যতি”।

যতি তিন প্রকার। যথা—
ক) পূর্ণ যতি খ)মধ্যযতি গ) লঘু বা হ্রস্ব যতি

উদাহরণ :-
নদীতীরে | বৃন্দাবনে || সনাতন |একমনে || জপিছেন | নাম ।।
এখানে সবশেষে আছে পূর্ণযতি , 'বৃন্দাবনে' ও 'একমনে'র পরে পড়েছে অর্ধযতি , আর 'নদীতীরে', ' সনাতন' ও 'জপিছেন' -এর পরে পড়েছে লঘুযতি।

পর্ব **:** বাক্য বা পদের এক হ্রস্ব যতি হতে আরেক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত অংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন- একলা ছিলেম । কুয়োর ধারে । নিমের ছায়া । তলে ।। কলস নিয়ে । সবাই তখন । পাড়ায় গেছে । চলে ।। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) (। – হ্রস্ব যতি ও ।। – দীর্ঘ যতি) এখানে একলা ছিলেম, কুয়োর ধারে, নিমের ছায়া, তলে- প্রতিটিই একেকটি পর্ব; মানে প্রতিটি চরণে ৪টি করে পর্ব।

মাত্রা **:** একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বলে। বাংলায় এই মাত্রাসংখ্যার নির্দিষ্ট নয়, একেক ছন্দে একেক অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা একেক রকম হয়। মূলত, এই মাত্রার ভিন্নতাই বাংলা

ছন্দগুলোর ভিত্তি। বিভিন্ন ছন্দে মাত্রাগণনার রীতি বিভিন্ন ছন্দের আলোচনায় দেয়া আছে।

শ্বাসাঘাত : প্রায়ই বাংলা কবিতা পাঠ করার সময় পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর একটা আলাদা জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত জোর দিয়ে পাঠ করা বা আবৃত্তি করাকেই বলা হয় শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর। যেমন- আমরা আছি | হাজার বছর | ঘুমের ঘোরের | গাঁয়ে || আমরা ভেসে | বেড়াই স্রোতের | শেওলা ঘেরা | নায়ে || (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এখানে প্রতিটি পর্বের প্রথম অক্ষরই একটু ঝোঁক দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত ঝোঁক বা জোরকেই শ্বাসাঘাত বলে।

পদ ও চরণ : দীর্ঘ যতি বা পূর্ণ যতি ছাড়াও এই দুই যতির মধ্যবর্তী বিরতির জন্য মধ্যযতি ব্যবহৃত হয় I দুই দীর্ঘ যতির মধ্যবর্তী অংশকে চরণ বলে, আর মধ্য যতি দ্বারা চরণকে বিভক্ত করা হলে সেই অংশগুলোকে বলা হয় পদ। যেমন- তরুতলে আছি | একেলা পড়িয়া ⊥ দলিত পত্র | শয়নে || তোমাতে আমাতে | রত ছিনু যবে ⊥ কাননে কুসুম | চয়নে|| (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) (এখানে ⊥ দ্বারা মধ্যযতি চিহ্নিত করা হয়েছে।) পূর্ণযতি দ্বারা আলাদা করা দুইটি অংশই চরণ; আর চরণের মধ্যযতি দিয়ে পৃথক করা অংশগুলো পদ। এরকম- যা আছে সব | একেবারে ⊥ করবে অধি | কার || (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স্তবক:

দুই বা এর অধিক চরণ সুশৃঙ্খলভাবে একত্রিত হলে তাকে “স্তবক” বলে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় STANZA। এক একটি স্তবকে কবিতার মূল ভাব অন্তত আংশিক প্রকাশ পায়। সব কয়টি স্তবক মিলে কবিতার সমগ্র ভাবের প্রকাশ ঘটায়। সাধারণত কবিতার স্তবকগুলো পরষ্পর বিচ্ছিন্ন

হয়। কবির ইচ্ছানুসারে দুই তিন চার প্রভৃতি যে কোন সংখ্যক চরণ নিয়ে স্তবক গঠিত হয়। যেমন-

যত বড় হোক । ইন্দ্রধনু সে । সুদূর আকাশে । আঁকা ।।
আমি ভালবাসি । মোর ধরণীর । প্রজাপতিটির । পাখা ।।
...
বিদায় চাহিতে । নয়নে নয়ন । রাখি ।।
ছলছলি এলো । আঁখি ।।
সকলি ভুলিলে । নাকি ।।

মিল : একাধিক পদ, পর্ব বা চরণের শেষে একই রকম ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ব্যবহারকে মিল বলে। অলংকারের ভাষায় একে বলে অনুপ্রাস। সাধারণত, মিল পদের শেষে থাকলেও শুরুতে বা মাঝেও মিল থাকতে পারে।

পদের শেষের মিলকে অন্ত্যমিল বলে। যেমন- মুখে দেয় জল | শুধায় কুশল | শিরে নাই মোর | হাত || দাঁড়ায়ে নিঝুম | চোখে নাই ঘুম | মুখে নাই তার | ভাত || (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এখানে, প্রথম চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষের পদদুটিতে অন্ত্যমিল (অল) আছে; দ্বিতীয় চরণের প্রথম দুই পদের শেষেও অন্ত্যমিল আছে (উম)। আবার দ্বিতীয় চরণের প্রথম দুই পদের শেষের ধ্বনি (ম) তৃতীয় পদের শুরুতে ব্যবহৃত হয়ে আরেকটি মিল সৃষ্টি করেছে। আর দুই চরণের শেষের পদেও অন্ত্যমিল আছে (আত)।

এবার, সুকান্ত ভট্টাচর্যের আঠারো বছর বয়স- কবিতার প্রথম দুটি স্তবকের ছন্দের এসব উপকরণ নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে সুবিধা হতে পারে। আঠারো বছর বয়স সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারো বছর | বয়স কী দুঃ | সহ || স্পর্ধায় নেয় | মাথা তোলবার | ঝুঁকি, || আঠারো বছর | বয়সেই অহ | রহ || বিরাট দুঃসা | হসেরা দেয় যে | উঁকি। ||| আঠারো বছর | বয়সের নেই | ভয় || পদাঘাতে চায় | ভাঙতে পাথর | বাধা, || এ বয়সে কেউ | মাথা নোয়াবার | নয়- || আঠারো বছর | বয়স জানে না

| কাঁদা। || উপরে কবিতাটির ছন্দ যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর পর্ব, পদ ও চরণ একরকম নির্দেশিত হয়েছে। প্রতিটি চরণে তিনটি পর্ব রয়েছে; প্রথম দুটি পর্ব ৬ মাত্রার, শেষ পর্বে ২ মাত্রার (মাত্রা গণনা নিচে ছন্দ অনুযায়ী আলোচনা করা আছে)। অর্থাৎ শেষ পর্বটিতে মাত্রা কম আছে। কবিতায় এরকম কম মাত্রার পর্বকে অপূর্ণ পর্ব বলে। কবিতাটির প্রতি চারটি চরণে কোন বিশেষ ভাব নির্দেশিত হয়েছে। এগুলোকে একেকটি স্তবক বলে। যেমন, প্রথম স্তবকটিকে কবিতাটির ভূমিকা বলা যেতে পারে, এখানে কবিতাটির মূলভাবই অনেকটা অনূদিত হয়েছে। আবার দ্বিতীয় স্তবকে আঠারো বছর বয়সের, অর্থাৎ তারুণ্যের নির্ভীকতা/ভয়হীনতা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে কবিতার একেকটি স্তবকে একেকটি ভাব বর্ণিত হয়। আবার কবিতাটির চরণের অন্ত্যমিলের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, প্রতি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের শেষে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে অন্ত্যমিল আছে। এছাড়া চরণগুলোর ভেতরেও খুঁজলে মিল পাওয়া যাবে।

বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ

বাংলা কবিতার ছন্দ মূলত ৩টি- স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। তবে বিংশ শতক থেকে কবিরা গদ্যছন্দেও কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। এই ছন্দে সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাস না থাকলেও ধ্বনিমাধুর্যটুকু অটুট রয়ে গেছে, যে মাধুর্যের কারণে ধ্বনিবিন্যাস ছন্দে রূপায়িত হয়। নিচে সংক্ষেপে ছন্দ ৩টির বর্ণনা দেয়া হল।

স্বরবৃত্ত ছন্দ :

ছড়ায় বহুল ব্যবহৃত হয় বলে, এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দও বলা হয়। • মূল পর্ব সবসময় ৪ মাত্রার হয় • প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে • সব অক্ষর ১ মাত্রা গুনতে হয় • দ্রুত লয় থাকে, মানে কবিতা আবৃত্তি করার সময় দ্রুত পড়তে হয়

উদাহরণ—
বাঁশ বাগানের | মাথার উপর | চাঁদ উঠেছে | ওই || (৪+৪+৪+১) মাগো আমার | শোলোক বলা | কাজলা দিদি | কই || (৪+৪+৪+১) (যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

এখানে প্রথম অক্ষরগুলো উচ্চারণের সময় শ্বাসাঘাত পড়ে, বা ঝোঁক দিয়ে পড়তে হয়। আর দাগাঙ্কিত অক্ষরগুলোতে মিল বা অনুপ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

এরকম- রায় বেশে নাচ | নাচের ঝোঁকে | মাথায় মারলে | গাঁট্টা || (৪+৪+৪+২) শ্বশুর কাঁদে | মেয়ের শোকে | বর হেসে কয় | ঠাট্টা || (৪+৪+৪+২) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
• মূল পর্ব ৪,৫,৬ বা ৭ মাত্রার হয় • অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়; আর অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে (য় থাকলেও) ২ মাত্রা গুনতে হয়; য় থাকলে, যেমন- হয়, কয়; য়-কে বলা যায় semi-vowel, পুরো স্বরধ্বনি নয়, তাই এটি অক্ষরের শেষে থাকলে মাত্রা ২ হয় • কবিতা আবৃত্তির গতি স্বরবৃত্ত ছন্দের চেয়ে ধীর, কিন্তু অক্ষরবৃত্তের চেয়ে দ্রুত
উদাহরণ-
এইখানে তোর | দাদির কবর | ডালিম-গাছের | তলে || (৬+৬+৬+২) তিরিশ বছর | ভিজায়ে রেখেছি | দুই নয়নের | জলে || (৬+৬+৬+২) (কবর; জসীমউদদীন) কবিতাটির মূল পর্ব ৬ মাত্রার। প্রতি চরণে তিনটি ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং একটি ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে। এখন মাত্রা গণনা

করলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম চরণের- প্রথম পর্ব- এইখানে তোর; এ+ই+খা+নে = ৪ মাত্রা (প্রতিটি অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা); তোর = ২ মাত্রা (অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় ২ মাত্রা) দ্বিতীয় পর্ব- দাদির কবর; দা+দির = ১+২ = ৩ মাত্রা; ক+বর = ১+২ = ৩ মাত্রা তৃতীয় পর্ব- ডালিম-গাছের; ডা+লিম = ১+২ = ৩ মাত্রা; গা+ছের = ১+২ = ৩ মাত্রা চতুর্থ পর্ব- তলে; ত+লে = ১+১ = ২ মাত্রা

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

- মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়
- অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়
- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, এমন অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে ২ মাত্রা হয়; শব্দের শুরুতে বা মাঝে থাকলে ১ মাত্রা হয়
- কোন শব্দ এক অক্ষরের হলে, এবং সেই অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে, সেই অক্ষরটির মাত্রা ২ হয়
- কোন সমাসবদ্ধ পদের শুরুতে যদি এমন অক্ষর থাকে, যার শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, তবে সেই অক্ষরের মাত্রা ১ বা ২ হতে পারে
- কবিতা আবৃত্তির গতি ধীর হয় উদাহরণ- হে কবি, নীরব কেন | ফাগুন যে এসেছে ধরায় || (৮+১০) বসন্তে বরিয়া তুমি | লবে না কি তব বন্দনায় || (৮+১০) কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি- || (১০) দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? || (১০) (তাহারেই পড়ে মনে; সুফিয়া কামাল) কবিতাটির মূল পর্ব ৮ ও ১০ মাত্রার। স্তবক দুইটি পর্বের হলেও এক পর্বেরও স্তবক আছে। এখন, মাত্রা গণনা করলে দেখা যায়, প্রথম চরণের, প্রথম পর্ব- হে কবি, নীরব কেন; হে কবি- হে+ক+বি = ৩ মাত্রা (তিনটি অক্ষরের প্রতিটির শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা); নীরব- নী+রব = ১+২ = ৩ মাত্রা (শব্দের শেষের অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় সেটি ২ মাত্রা); কেন- কে+ন = ১+১ = ২ মাত্রা; মোট ৮ মাত্রা আবার দ্বিতীয় চরণের, দ্বিতীয় পর্ব- লবে না কি তব বন্দনায়; লবে- ল+বে = ২ মাত্রা; না কি তব =

না+কি+ত+ব = ৪ মাত্রা; বন্দনায়- বন+দ+নায় = ১+১+২ = ৪ মাত্রা (বন- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলেও অক্ষরটি শব্দের শেষে না থাকায় এর মাত্রা ১ হবে; আবার নায়- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি- য় থাকায়, এবং অক্ষরটি শব্দের শেষে থাকায় এর মাত্রা হবে ২); মোট ১০ মাত্রা এরকম- আসি তবে | ধন্যবাদ || (৪+৪) না না সে কি, | প্রচুর খেয়েছি || (৪+৬) আপ্যায়ন সমাদর | যতটা পেয়েছি || (৮+৬) ধারণাই ছিলো না আমার- ||

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপভেদ বা প্রকারভেদ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আবার অনেকগুলো রূপভেদ বা প্রকার আছে—পয়ার, মহাপয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, দিগক্ষরা, একাবলী, সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল—

সনেট :

• বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

• বাংলায় উল্লেখযোগ্য সনেট রচয়িতা- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, ফররুখ আহমদ,কামিনী রায়, প্রমুখ
• ১৪ বা ১৮ মাত্রার চরণ হয়
• দুই স্তবকে ১৪টি চরণ থাকে
• সাধারণত দুই স্তবকে যথাক্রমে ৮টি ও ৬টি চরণ থাকে (চরণ বিন্যাসে ব্যতিক্রম থাকতে পারে)
• প্রথম আটটি চরণের স্তবককে অষ্টক ও শেষ ৬টি চরণের স্তবককে ষটক বলে
• এছাড়া সনেটের অন্ত্যমিল ও ভাবের মিল আছে এমন চারটি চরণকে একত্রে চৌপদী, তিনটি পদকে ত্রিপদীকা বলে

• নির্দিষ্ট নিয়মে অন্ত্যমিল থাকে
• দুইটি স্তবকে যথাক্রমে ভাবের বিকাশ ও পরিণতি থাকতে হয়; ব্যাপারটাকে সহজে ব্যাখ্যা করতে গেলে তা অনেকটা এভাবে বলা যায়- প্রথম স্তবকে কোন সমস্যা বা ভাবের কথা বলা হয়, আর দ্বিতীয় স্তবকে সেই সমস্যার সমাধান বা পরিণতি বর্ণনা করা হয়
• সনেটের ভাষা মার্জিত এবং ভাব গভীর ও গম্ভীর হতে হয়
• সনেট মূলত ৩ প্রকার- পেত্রার্কীয় সনেট, শেক্সপীয়রীয় সনেট ও ফরাসি সনেট; এই ৩ রীতির সনেটের প্রধান পার্থক্য অন্ত্যমিলে। এছাড়া ভাব, বিষয় ও স্তবকের বিভাজনেও কিছু পার্থক্য আছে (তা ব্যাকরণের ছন্দ প্রকরণের আলোচ্য নয়)। নিচে ৩ প্রকার সনেটের অন্ত্যমিলের পার্থক্য দেখান হল- পেত্রার্কীয় রীতিক+খ+খ+ক ক+খ+খ+কচ+ছ+জ চ+ছ+জ শেক্সপীয়রীয় রীতিক+খ+ক+খগ+ঘ+গ+ঘচ+ছ+চ+ছজ+জ ফরাসি রীতিক+খ+খ+ক ক+খ+খ+কগ+গ চ+ছ+চ+ছ উদাহরণ- হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন;- || (৮+৬) ক তা সবে, (অবোধ আমি!) | অবহেলা করি, || (৮+৬) খ পর-ধন-লোভে মত্ত, | করিনু ভ্রমণ || (৮+৬) ক পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি | কুক্ষণে আচরি। || (৮+৬) খ অষ্টক কাটাইনু বহু দিন | সুখ পরিহরি। || (৮+৬) খ অনিদ্রায়, অনাহারে | সঁপি কায়, মনঃ, || (৮+৬) ক মজিনু বিফল তপে | অবরেণ্যে বরি;- || (৮+৬) খ কেলিনু শৈবালে, ভুলি | কমল-কানন। || (৮+৬) ক স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী | কয়ে দিলা পরে,- || (৮+৬) গ ওরে বাছা, মাতৃকোষে | রতনের রাজি ||, (৮+৬) ঘ এ ভিখারী-দশা তবে | কেন তোর আজি? || (৮+৬) ঘ ষটক যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, | যা রে ফিরি ঘরে। || (৮+৬) গ পালিলাম আজ্ঞা সুখে; | পাইলাম কালে || (৮+৬) ঙ মাতৃভাষা-রূপ খনি, | পূর্ণ মণিজালে । ||। (৮+৬) ঙ (বঙ্গভাষা; মাইকেল মধুসূদন দত্ত) কবিতাটিতে দুই স্তবকে যথাক্রমে ৮ ও ৬ চরণ নিয়ে মোট ১৪টি চরণ আছে। প্রতিটি চরণে ৮ ও ৬ মাত্রার দুই পর্ব মিলে মোট ১৪ মাত্রা আছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

• বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

• অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবের প্রবহমানতা; অর্থাৎ, এই ছন্দে ভাব চরণ-অনুসারী নয়, কবিকে একটি চরণে একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করতেই হবে- তা নয়, বরং ভাব এক চরণ থেকে আরেক চরণে প্রবহমান এবং চরণের মাঝেও বাক্য শেষ হতে পারে

• বিরামচিহ্নের স্বাধীনতা বা যেখানে যেই বিরামচিহ্ন প্রয়োজন, তা ব্যবহার করা এই ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য

• অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্যমিল থাকে না, বা চরণের শেষে কোন মিত্রাক্ষর বা মিল থাকে না

• মিল না থাকলেও এই ছন্দে প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ১৪) এবং পর্বেও মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ৮++৬) উদাহরণ- তথা জাগে রথ, রথী, গজ, | অশ্ব, পদাতিক || (৮+৬) অগণ্য। দেখিলা রাজা | নগর বাহিরে, || (৮+৬) রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ | সিন্ধুতীরে যথা, || (৮+৬) নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা | আকাশ-মণ্ডলে। || (৮+৬) (মেঘনাদবধকাব্য; মাইকেল মধুসূদন দত্ত) এখানে কোন চরণের শেষেই অন্ত্যমিল নেই। আবার প্রথম বাক্যটি চরণের শেষে সমাপ্ত না হয়ে প্রবাহিত হয়ে একটি চরণের শুরুতেই সমাপ্ত হয়েছে (তথা জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক অগণ্য)। এই অন্ত্যমিল না থাকা এবং ভাবের বা বাক্যের প্রবহমানতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য।

গদ্যছন্দ

• এই ছন্দে বাংলায় প্রথম যারা কবিতা লিখেছিলেন তাদের অন্যতম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

• মূলত ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী শিল্পমুক্তির আন্দোলনের ফসল হিসেবে এর জন্ম
• গদ্য ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- গদ্যের মধ্যে যখন পদ্যের রঙ ধরানো হয় তখন গদ্যকবিতার জন্ম হয়
• পর্বগুলো নানা মাত্রার হয়, সাধারণত পর্ব-দৈর্ঘ্যে কোন ধরনের সমতা বা মিল থাকে না • পদ ও চরণ যতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন দ্বারা নির্ধারিত হয়; এই বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন উচ্চারণের সুবিধার্থে নয়, বরং অর্থ প্রকাশের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়
• গদ্যকবিতা গদ্যে লেখা হলেও তা পড়ার সময় এক ধরনের ছন্দ বা সুরের আভাস পাওয়া যায়
• গদ্যকবিতা গদ্যে লেখা হলেও এর পদবিন্যাস কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ও পুনর্বিন্যাসিত হতে হয় উদাহরণ- আমার পূর্ব-বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ সন্ধ্যার উন্মেষের মতো সরোবরের অতলের মতো কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

☆★☆★☆★☆

ছন্দ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

প্রশ্নঃ সনেটের ক’টি অংশ?
উত্তর: দুটি
প্রশ্নঃ সনেটের প্রথম অংশকে কী বলে?
উত্তর:অষ্টক।
প্রশ্নঃ সনেটের শেষ অংশকে কী বলে?
উত্তর: ষষ্টক
প্রশ্নঃ ‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ’ কোন ছন্দ?

উত্তর: পয়ার
প্রশ্নঃ কোন কবি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্রশ্নঃ ‘পয়ার’ কোন ছন্দের অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: অমিত্রাক্ষর
প্রশ্নঃ বাংলা কবিতায় ‘ছন্দের জাদুকর’ কে?
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রশ্নঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি কয় মাত্রার?
উত্তর: ২
প্রশ্নঃ মাইকের মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে কোথায়?
উত্তর: সনেটে
প্রশ্নঃ “আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগর তীরে।”- কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: স্বরবৃত্ত
প্রশ্নঃ ছড়া কোন ছন্দে রচিত হয়?
উত্তর: স্বরবৃত্ত
প্রশ্নঃ বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনার প্রবর্তক কে? উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রশ্নঃ ছেলে-ভুলানো ছড়াসমূহ সাধারণত কোন ছন্দে লেখা হয়?
উত্তর: স্বরবৃত্ত
প্রশ্নঃ ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলা হয় কোন ছন্দকে?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত
প্রশ্নঃ রবীন্দ্রনাথ কোন ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলেছেন?
উত্তর: স্বরবৃত্ত
প্রশ্নঃ স্বরবৃত্ত ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা কত?
উত্তর: চার
প্রশ্নঃ কোন ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব জায়গাতেই দুই মাত্রা হবে?

উত্তর: মাত্রাবৃত্ত
প্রশ্নঃ ‘সনেট’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?
উত্তর: ইটালিয়ান
প্রশ্নঃ ‘লৌকিক ছন্দ’ কাকে বলে?
উত্তর: স্বরবৃত্তকে
প্রশ্নঃ বাংলা ছন্দ কত রকমের?
উত্তর: তিন রকমের
প্রশ্নঃ ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান’ -কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: স্বরবৃত্ত
প্রশ্নঃ ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য বলো।
উত্তর: অন্ত্যমিল নেই
প্রশ্নঃ যে ছন্দে যুক্তধ্বনি সবসময় একমাত্রা হিসাবে গননা করা হয় তাকে কি ধরনের ছন্দ বলে?
উত্তর: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
প্রশ্নঃ স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রশ্নঃ “খাঁচার পাথি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে” কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত
প্রশ্নঃ বাংলা ছন্দ প্রধানত কত প্রকার?
উত্তর: ৩
প্রশ্নঃ যৌগিক ছন্দ বলা হয় কোন ছন্দকে?
উত্তর: অক্ষরবৃত্ত
প্রশ্নঃ ‘বঙ্গভাষা’ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন ধরনের রচনা?
উত্তর: সনেট
প্রশ্নঃ যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়-

উত্তর: স্বরবৃত্ত

সূত্র : পলাশ সরকার

কাব্য ও ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে—এ কথা স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক্। পদ্যের ভাষা বিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয়, সে গৃহীর থেকে পৃথক্; ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে—নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে, আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয়—যে কাপড়ে বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে, স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে; আর-এক হচ্ছে, পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময় মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যকার আর-একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে কুলস্ত্রীরা

অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা, প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন, যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহু দূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।
অর্থাৎ, লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায়, পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ির সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য

কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না—এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বে প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই করে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি, তার হাজার প্রমাণ আছে; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে; আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে,যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে, এমনতরো তাদের জিদ।

তারা এই কথাই বলতে চায়, আসল কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাত্যাহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।